#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

MAINS TOPIC

DEEP ANALYSIS

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

From

27th April to 02nd May 2026

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** **01**
    - 1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা 01
        - 1.1.1. ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম 01
    - 1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 04
        - 1.2.1. OPEC থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রস্থান: বৈশ্বিক তেল রাজনীতি এবং ভারতের ওপর প্রভাব 04
        - 1.2.2. জাতিসংঘ মহাসচিব 07
2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** **10**
    - 2.1. অর্থনীতি 10
        - 2.1.1. রুপির অবমূল্যায়ন এবং বিনিয়োগের ওপর এর প্রভাব 10
    - 2.2. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 13
        - 2.2.1. ভারতের মহাকাশ কূটনীতি 13

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM

IAS 10-Month GS PCM

Degree + IAS

Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি **দিল্লি হাইকোর্ট** "ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম" নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি অনেক সময় মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ছাড়িয়ে **প্রকাশ্যে অপমান করার হাতিয়ার** হয়ে উঠতে পারে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম কী?

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে সাধারণ নাগরিকরা ডিজিটাল মাধ্যম—প্রধানত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে—এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে এবং **"শাস্তি"** দেওয়ার চেষ্টা করে, যাদের তারা কোনো আইনি বা নৈতিক অপরাধে দোষী বলে মনে করে। সাধারণ ভিজিল্যান্টিজমে শারীরিক সংঘাত হতে পারে, কিন্তু ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম মূলত **তথ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার** করে কাজ করে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের মূল বৈশিষ্ট্য

- **ক্রাউডসোর্সড অ্যাকশন (Crowdsourced Action):** এতে প্রায়ই "পাইল-অন" প্রভাব দেখা যায়, যেখানে হাজার হাজার অপরিচিত মানুষ একটি অভিযোগ শেয়ার করে, মন্তব্য করে এবং সেটিকে ছড়িয়ে দেয়।
- **ডক্সিং (Doxxing):** এটি একটি সাধারণ কৌশল যেখানে লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য (বাড়ির ঠিকানা, ফোন নম্বর, কর্মস্থল) ইন্টারনেটে ফাঁস করে দেওয়া হয় যাতে তাকে বাস্তবে হয়রানি করা যায়।
- **পাবলিক শেমিং (Public Shaming):** এর মূল লক্ষ্য থাকে প্রায়ই **"সামাজিক মৃত্যু"**—অর্থাৎ একজন ব্যক্তির সম্মান, জীবিকা বা সামাজিক অবস্থান ধ্বংস করা।
- **আইনি প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে যাওয়া (Bypassing Due Process):** এটি প্রচলিত আইনি ব্যবস্থার বাইরে কাজ করে এবং একই সাথে তদন্তকারী, বিচারক ও জল্লাদের ভূমিকা পালন করে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের আইনি ও সাংবিধানিক দিক

- **মৌলিক অধিকার:** সংবিধানের **ধারা ১৯(১)(এ)** অনলাইনে মতপ্রকাশের অধিকার দেয়, তবে **ধারা ১৯(২)** রাষ্ট্রকে মানহানি, জনশৃঙ্খলা রক্ষা বা নৈতিকতার স্বার্থে এই অধিকারের ওপর **"যৌক্তিক বিধিনিষেধ"** আরোপ করার অনুমতি দেয়।
- **সম্মানের অধিকার:** সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলেছে যে, একজন ব্যক্তির সম্মান বা খ্যাতি **ধারা ২১**-এর অধীনে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তাকে যথেচ্ছ সামাজিক অপমান থেকে রক্ষা করে।
- **প্রাকৃতিক ন্যায়ের নীতি (Principles of Natural Justice):** এটি অভিযুক্তের **পক্ষ সমর্থনের সুযোগ** এবং **দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ** গণ্য হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে। ডিজিটাল জনতা (Mob) তাৎক্ষণিক "রায়" দিয়ে এই নীতিগুলো লঙ্ঘন করে।
- **প্রাসঙ্গিক আইনি বিধান:** IPC-**এর ৪৯৯-৫০০ ধারা** মানহানির বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার দেয়। অন্যদিকে, IT Act বা তথ্যপ্রযুক্তি আইন প্ল্যাটফর্মগুলোর দায়বদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং অবৈধ কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম কেন সৃষ্টি হয়?

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম মূলত **প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার** একটি উপজাত (Byproduct) হিসেবে আবির্ভূত হয়। যখন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা সময়মতো বা কার্যকর সমাধান দিতে পারে না, তখন জনগণ নিজেরাই বিচার করতে রাস্তায় (বা ইন্টারনেটে) নামে।

- **পদ্ধতিগত উদাসীনতা:** পুলিশ, বিচার বিভাগ বা বড় সংস্থাগুলোর ওপর মানুষের আস্থার অভাব। মানুষ মনে করে যে যৌন হয়রানি বা দুর্নীতির মতো অভিযোগের প্রতিকার তারা দ্রুত বা সঠিকভাবে পাবে না।
- **জবাবদিহিতার অভাব:** যেখানে আইনি ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়, সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এটি পাবলিক শেমিং বা সামাজিক অপমানের মাধ্যমে ধীরগতির প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে।
- **যৌথ অসহায়ত্ব:** সাধারণ মানুষ ব্যবস্থার কাছে নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করে; ডিজিটাল "মব" বা জনতা তাদের মধ্যে একটি ক্ষমতায়নের অনুভূতি এবং তাৎক্ষণিক মানসিক প্রশান্তি তৈরি করে।
- **প্রযুক্তিগত সহজলভ্যতা:** ইন্টারনেটের ছদ্মনাম, গতি এবং বিশাল পরিধি প্রচলিত বাধাগুলোকে এড়িয়ে খুব কম খরচে বড় ধরনের **"প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা"** নেওয়ার সুযোগ করে দেয়।
- **সংহতির সন্ধান:** যখন ভুক্তভোগীরা সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে অবহেলিত বা দোষারোপের শিকার হন, তখন তারা ডিজিটাল সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সমর্থন এবং স্বীকৃতি খোঁজেন।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের ইতিবাচক দিক

- **নিপীড়িতের কণ্ঠস্বর:** এটি বিচারের গণতন্ত্রীকরণ করে। এর মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষজন পক্ষপাতদুষ্ট আইনি বাধা এড়িয়ে সরাসরি বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাতে পারে। এই **"বিশাল সমতাকারী" (Great Equalizer)** ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করে যে, যাদের সামাজিক প্রতিপত্তি নেই তারাও যেন জনসাধারণের সমর্থন ও স্বীকৃতি পায়।
- **জবাবদিহিতার কৌশল:** ইন্টারনেটে কোনো বিষয় ছড়িয়ে পড়লে প্রতিষ্ঠানের সুনামের ঝুঁকি তৈরি হয়। এটি উদাসীন কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থাগুলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে। যেখানে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ সেল বা তদারকি কমিটি ব্যর্থ হয়, সেখানে এটি সেই শূন্যতা পূরণ করে।
- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো জনসমক্ষে আনার ফলে কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও বৈষম্যের মতো পদ্ধতিগত সমস্যাগুলো নিয়ে সমাজে আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়। এই **যৌথ দৃশ্যমানতা** অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী নীতি পরিবর্তন এবং আইনি সংস্কারের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।
- **গতি:** যেখানে আইনি লড়াই শেষ হতে বছরের পর বছর সময় লাগে, সেখানে **"জনসাধারণের আদালত"** তাৎক্ষণিক সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেয়। এই দ্রুত প্রতিক্রিয়া ভুক্তভোগীকে মানসিক শান্তি দেয় এবং রিয়েল-টাইমে অপরাধ বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে।

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের চ্যালেঞ্জসমূহ

- **প্রাকৃতিক ন্যায়ের লঙ্ঘন:** এতে প্রায়ই “Audi alteram partem” (অপর পক্ষের কথা শোনা) নীতিটি উপেক্ষা করা হয়। ইন্টারনেট এখানে একপাক্ষিক ট্রাইব্যুনাল হিসেবে কাজ করে যেখানে অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় না। এর ফলে একটি "প্রমাণিত হওয়ার আগেই দোষী" পরিবেশ তৈরি হয়, যা সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তিকে দুর্বল করে।
- **মিডিয়া ট্রায়াল:** জনমত এবং ইন্টারনেটের ক্ষোভ কার্যকরভাবে আনুষ্ঠানিক বিচারিক প্রক্রিয়ার জায়গা দখল করে নেয়। কোনো তথ্য আইনত পরীক্ষা করার আগেই "রায়" দিয়ে দেওয়া হয়। এটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং সমাজের চোখে আগেভাগেই একজনকে অপরাধী বানিয়ে ফেলে।
- **মিথ্যা অভিযোগ:** সোশ্যাল মিডিয়ায় সঠিক যাচাইকরণ ব্যবস্থার অভাবে ভিত্তিহীন বা বিদ্বেষমূলক দাবিগুলো অবাধে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে **অপূরণীয় সম্মানের হানি** হওয়ার ঝুঁকি থাকে, কারণ পরে যদি কোনো ভুল সংশোধনও করা হয়, তা মূল ভাইরাল হওয়া মিথ্যার মতো সমান সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছায় না।

- **উচ্ছৃঙ্খল মানসিকতা:** অনলাইন ক্ষোভ দ্রুত **"ডিজিটাল লিঞ্চিং"** বা গণপিটুনিতে রূপ নিতে পারে। যেখানে যৌথ ক্রোধ শেষ পর্যন্ত হয়রানি, পিছু নেওয়া এবং প্রাণনাশের হুমকিতে পরিণত হয়। এই আক্রমণাত্মক পরিবেশ গঠনমূলক বিচারের চেয়ে আবেগের বহিঃপ্রকাশকে বেশি গুরুত্ব দেয়।
- **গোপনীয়তা লঙ্ঘন (Privacy Violations): "ডক্সিং"** (Doxxing) বলতে কারও ব্যক্তিগত তথ্য যেমন—বাড়ির ঠিকানা বা ব্যক্তিগত কন্টাক্ট নম্বর ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করাকে বোঝায়। ব্যক্তিগত তথ্যের এই অপব্যবহার ব্যক্তি ও তার পরিবারকে শারীরিক ঝুঁকির মুখে ফেলে এবং গোপনীয়তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে।
- **বাক-স্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব:** ডিজিটাল মব বা "সামাজিক অপমানের" শিকার হওয়ার ভয়ে অনেকে ভিন্নমত বা অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করতে সাহস পান না। এর ফলে মানুষ নিজের ওপর নিজেই সেন্সরশিপ আরোপ করে, যা উন্মুক্ত আলোচনাকে স্তব্ধ করে দেয় এবং সুস্থ সামাজিক বিতর্কের জায়গা সংকুচিত করে।

কেস স্টাডি

বিমান পরিষেবা বিভ্রাট (২০২২): এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটের বিজনেস ক্লাসে একজন পুরুষ যাত্রী এক বৃদ্ধার গায়ে প্রস্রাব করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনরোষ তৈরি হওয়ার পরই কেবল বিমান সংস্থাটি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিল।

পথনির্দেশ

- **প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিকার শক্তিশালী করা:** ভুক্তভোগীরা যেন সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারস্থ না হয়, সেজন্য প্রতিটি সংস্থায় শক্তিশালী ও সময়োপযোগী অভিযোগ কেন্দ্র (যেমন- **অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি** বা **"নো-ফ্লাই" লিস্ট**) কার্যকর করা প্রয়োজন।
- **বিচার বিভাগ ও পুলিশ সংস্কার:** আনুষ্ঠানিক আইনি প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করতে হবে এবং পুলিশ বাহিনীকে সংবেদনশীল করে তুলতে হবে। এতে বিচার ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা ফিরবে এবং আদালতই বিচারের প্রধান জায়গা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।
- **ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা:** গণমাধ্যম এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের উচিত কোনো অভিযোগ প্রচার করার আগে তা ভালভাবে যাচাই করা (Verification-First)। এতে ভুল তথ্য ছড়ানো এবং কারও সম্মানহানি রোধ করা সম্ভব হবে।
- **DPDP আইন ও RTBF-এর প্রয়োগ: ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইন** (DPDP Act, 2023) এবং **"ভুলে যাওয়ার অধিকার"** (Right to be Forgotten) কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে, যাতে মানুষ মিথ্যা বা পুরনো অপমানজনক তথ্য ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে।
- **ধারা ১৯ এবং ২১-এর মধ্যে ভারসাম্য:** রাষ্ট্রকে এমন নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে যা বৈধ অনলাইন সক্রিয়তা এবং ক্ষতিকর ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজমের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। নিশ্চিত করতে হবে যেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা (ধারা ১৯) কারও ন্যায্য বিচারের অধিকারকে (ধারা ২১) নষ্ট না করে।

উপসংহার

ডিজিটাল ভিজিল্যান্টিজম হলো প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার ব্যর্থতার একটি লক্ষণ। আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে আমাদের অবশ্যই আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী, দ্রুত এবং সহানুভূতিশীল করতে হবে, যাতে **"মব জাস্টিস"** বা গণবিচার অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

Q. "Digital vigilantism is less a problem of social media excess and more a reflection of institutional failure." Critically examine. 15 Words

1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1.2.1. OPEC থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রস্থান: বৈশ্বিক তেল রাজনীতি এবং ভারতের ওপর প্রভাব

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, আবু ধাবির নেতৃত্বে **সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE)**, ২০২৬ সালের ১ মে থেকে **OPEC এবং OPEC+** থেকে বেরিয়ে যাবে। এটি বিশ্বের জ্বালানি ভূ-রাজনীতিতে (energy geopolitics) একটি বিশাল পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

OPEC থেকে আমিরাতের বেরিয়ে যাওয়ার কারণসমূহ

- **'পিক অয়েল' বা তেলের বাজার ধরার লড়াই (Monetizing 'Peak Oil'):** সারা বিশ্বে তেলের চাহিদা খুব দ্রুতই এক জায়গায় স্থবির হয়ে যেতে পারে। তাই আবু ধাবি চায় তাদের গচ্ছিত **১০০ বিলিয়ন ব্যারেল** তেল এখন যতটা সম্ভব উত্তোলিত করে বিক্রি করে দিতে। ইলেকট্রিক যানবাহন (EV) এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ার ফলে তেলের দাম কমে যাওয়ার আগেই তারা সর্বোচ্চ লাভ তুলে নিতে চায়।
- **'ভিশন ২০৩১' (Vision 2031) প্রকল্পে অর্থায়ন:** তেলের অতিরিক্ত আয় থেকে আমিরাত একটি **জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতি** (knowledge-based economy) গড়ে তুলতে চায়। তাদের লক্ষ্য প্রযুক্তি, পর্যটন এবং পণ্য পরিবহন (logistics) খাতের উন্নয়ন করা।
- **অব্যবহৃত ক্ষমতা এবং বিনিয়োগের সুফল (Idle Capacity & ROI):** আমিরাত তাদের তেলের উৎপাদন ক্ষমতা দিনে **৫০ লক্ষ ব্যারেলে** (5 mbpd) নিয়ে যাওয়ার জন্য **১৫০ বিলিয়ন ডলার** বিনিয়োগ করেছে। ওপেকের বাধ্যতামূলক উৎপাদন কমানোর নিয়মের ফলে তাদের এই বিশাল পরিকাঠামো কোনো কাজে আসছিল না, যা তাদের জন্য আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
- **সৌদি আরবের প্রভাব থেকে মুক্তি (Strategic Autonomy):** এই পদক্ষেপটি সৌদি-নির্ভর নীতি থেকে বেরিয়ে আসার একটি বড় প্রচেষ্টা। এটি আমিরাতকে সৌদি আরবের **'প্রজেক্ট এইচকিউ'** (যেখানে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে রিয়াদে সদর দপ্তর সরানোর চাপ দেওয়া হচ্ছে) এর বিরুদ্ধে অবাধে প্রতিযোগিতা করার এবং নিজেদের আঞ্চলিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেবে।
- **দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রাধিকার (Preference for Bilateralism):** ওপেকের সম্মিলিত দর কষাকষির নীতি এড়িয়ে এখন আমিরাত সরাসরি **ভারতের** মতো বন্ধু দেশগুলিকে **সরাসরি ছাড়** (direct discounts) এবং দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি সরবরাহের গ্যারান্টি দিতে পারবে। বিনিময়ে তারা ভারতের থেকে বড় ধরনের কৌশলগত বিনিয়োগ পাবে।
- **সবুজ জ্বালানির ভাবমূর্তি (Green Energy Rebranding):** তেলের জোট বা "অয়েল কার্টেল" থেকে বেরিয়ে আসা আমিরাতকে একটি **বহুমুখী জ্বালানি পরাশক্তি** হিসেবে তুলে ধরতে সাহায্য করবে। তারা গ্রিন হাইড্রোজেন এবং পারমাণবিক শক্তির ওপর জোর দিয়ে নিজেদের পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দেশ হিসেবে প্রমাণ করতে চায়।

বৈশ্বিক জ্বালানি ব্যবস্থার ওপর প্রভাব

- **তেল জোটের ক্ষমতা হ্রাস (Weakening of the Cartel):** ওপেকের মোট উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় **১৪%** আমিরাতের দখলে। তাদের প্রস্থানের ফলে ওপেকের তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অনেকটা কমে যাবে এবং বাজার এখন আর জোটবদ্ধ নয়, বরং **মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক** মডেলে চলবে।
- **দামের চেয়ে পরিমাণকে গুরুত্ব (Volume over Price):** সৌদি আরবের তেলের দাম বাড়িয়ে রাখার কৌশলের বদলে আবু ধাবি এখন বেশি পরিমাণে তেল বিক্রির ওপর জোর দিচ্ছে। এটি তেলের বাজার শেষ হওয়ার আগেই নিজেদের সম্পদ নগদায়ন করার একটি **প্রতিযোগিতা** শুরু করে দেবে।

- **ভূ-রাজনৈতিক খণ্ডন (Geopolitical Fragmentation):** এই পদক্ষেপটি OPEC+ **ঐক্যের** ভাঙন নিশ্চিত করে। এর ফলে বিশ্ব এখন কোনো একটি গোষ্ঠীর বদলে **দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের** (যেমন ভারত-ইউএই) দিকে বেশি ঝুঁকবে।
- **জ্বালানি পরিবর্তনের ভর্তুকি (Energy Transition Subsidy):** আমিরাত তেলের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দিয়ে তাদের **নবায়নযোগ্য জ্বালানি** প্রকল্পগুলোকে শক্তিশালী করছে। তেলের টাকায় গ্রিন হাইড্রোজেন এবং পারমাণবিক প্রকল্পের উন্নয়ন করে তারা বিশ্বের সামনে একটি নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করছে।
- **প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর চাপ (Market Pressure on Rivals):** আমিরাতের তেলের সরবরাহ বাড়লে বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমতে পারে। এতে ভারত বা চীনের মতো আমদানিকারক দেশগুলো লাভবান হলেও **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল এবং গায়ানার** মতো তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর আয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে।

ভারতের জন্য তাৎপর্য

১. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস**

- **রাজস্ব স্বস্তি:** অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ১ ডলার কমলে ভারতের আমদানি ব্যয় প্রায় **১০,০০০ কোটি টাকা** কমে যায়। সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) তার পূর্ণ ক্ষমতায় (৫ mbpd) উৎপাদন করলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমবে, যা ভারতের **চলতি হিসাবের ঘাটতি (CAD)** নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।
- **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ:** জ্বালানি খরচ কমলে পরিবহন এবং খাদ্যের দাম কমে আসে, যা ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে (RBI) তাদের **ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI)** ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. **উন্নত জ্বালানি নিরাপত্তা**

- **উৎস বহুমুখীকরণ:** ওপেকের (OPEC) উৎপাদন কোটার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ভারত এখন সরাসরি সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে **দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ চুক্তি** করতে পারবে। এটি অস্থির "OPEC+ ঐক্যের" ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা কমাবে।
- **ভৌগোলিক সুবিধা:** রাশিয়া বা আমেরিকার তুলনায় আমিরাত ভারতের অনেক কাছে অবস্থিত। এর ফলে তেলের **পরিবহন খরচ** অনেক কম হয় এবং ভারতীয় শোধনাগারগুলোতে তেল দ্রুত পৌঁছাতে পারে।

৩. **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ**

- আবু ধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি (ADNOC) ইতিমধ্যেই ম্যাঙ্গালুরুর কৌশলগত ভাণ্ডারে তেল মজুত করে ভারতের সাথে সহযোগিতা করছে। ওপেক থেকে আমিরাতের প্রস্থানের পর, তারা ভারতে তেলের মজুত আরও বাড়াতে পারবে, যা বৈশ্বিক সংকট বা ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার সময়েও ভারতের জন্য **নিশ্চিত সরবরাহ** বজায় রাখবে।

৪. **সেপা (CEPA) চুক্তিকে শক্তিশালী করা**

- ২০২২ সালে স্বাক্ষরিত **কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (CEPA)** হলো ভারত-ইউএই সম্পর্কের মূল ভিত্তি। ভারত আমিরাতকে তেলের নিশ্চিত চাহিদার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে এবং বিনিময়ে আমিরাত সেই তেলের আয় ভারতের পরিকাঠামো এবং **ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরে (IMEC)** পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারে।

৫. **"রিফাইনিং হাব" বা শোধনাগার কেন্দ্র হওয়ার লক্ষ্যে সহায়তা**

- ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে তার তেল শোধনের ক্ষমতা বাড়িয়ে **৪৫০ mmtpa** করার লক্ষ্য নিয়েছে। একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আমিরাত নির্দিষ্ট গ্রেডের অপরিশোধিত তেলের স্থিতিশীল সরবরাহকারী হতে পারে, যা ভারতকে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং পেট্রোকেমিক্যালস রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষস্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

৬. **সবুজ জ্বালানি সহযোগিতায় রূপান্তর**

- সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ভারত উভয় দেশই তেল থেকে উপার্জিত অর্থ গ্রিন হাইড্রোজেন এবং সৌরশক্তিতে বড় বিনিয়োগের কাজে লাগাচ্ছে। এটি ভারতের **ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন**-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা "পিক অয়েল" যুগের পরেও দুই দেশের মধ্যে যৌথ গবেষণা (R&D) এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেবে।

ভারতের জন্য সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ

- **বাজারের অস্থিরতা:** ওপেকের স্থিতিশীল প্রভাব কমে যাওয়ায় তেলের দামে **তীব্র ওঠানামা** হতে পারে, যা ভারতের বাজেট এবং আর্থিক পরিকল্পনা বজায় রাখা কঠিন করে তুলবে।
- **ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য:** সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক খারাপ না করেই আমিরাতের সাথে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা ভারতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ **সৌদি আরব** এখনও ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি অংশীদার এবং ওপেকের নেতা।
- **নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রভাব:** আমিরাতের সস্তা তেলের আধিক্য ভারতের **নবায়নযোগ্য জ্বালানি** (Renewable Energy) ব্যবহারের গতি কমিয়ে দিতে পারে, যা ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের 'নেট জিরো' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে পিছিয়ে দিতে পারে।
- **আঞ্চলিক অস্থিরতা:** এই প্রস্থান যদি উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে "মূল্য যুদ্ধ" বা বিরোধ তৈরি করে, তবে তা মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা ডেকে আনতে পারে। এর ফলে সেখানে কর্মরত **৯০ লক্ষ ভারতীয় প্রবাসীর** নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে।
- **সরবরাহ শৃঙ্খলের ঝুঁকি:** কোনো জোটের বদলে শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ওপর বেশি নির্ভরশীল হওয়া মানে হলো আমিরাতের **অভ্যন্তরীণ নীতি পরিবর্তন** বা রাজনৈতিক অস্থিরতার ওপর ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়া।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **দ্বিপাক্ষিক জ্বালানি কূটনীতি গভীর করা:** শুধুমাত্র ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্কের বাইরে গিয়ে আমিরাতের তেলের খনিতে **যৌথ বিনিয়োগ** এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থির-মূল্যের চুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- **কৌশলগত ভাণ্ডার সম্প্রসারণ:** আমিরাতের উৎপাদন নমনীয়তাকে কাজে লাগিয়ে ভারতের পাদুর (Padur) এবং চণ্ডীখোলের (Chandikhole) **দ্বিতীয় পর্যায়ের কৌশলগত তেলের ভাণ্ডার** (SPR) দ্রুত পূর্ণ করতে হবে।
- **পশ্চিম এশিয়ার সম্পর্কের ভারসাম্য:** একটি **"ডি-হাইফেনটেড" (de-hyphenated) নীতি** অনুসরণ করে আমিরাত এবং সৌদি আরব—উভয় দেশের সাথেই শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।
- **সমন্বিত জ্বালানি রূপান্তর:** সস্তা তেলের কারণে সাশ্রয় হওয়া অর্থ **ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনে** ব্যয় করতে হবে এবং আমিরাতের সাথে কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তিতে সহযোগিতা বাড়াতে হবে।
- IMEC **রুটের শক্তিশালীকরণ:** ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে যাতে জ্বালানি গ্রিড এবং পাইপলাইনগুলোকে সরাসরি সংযুক্ত করা যায়।
- **শোধনাগারের আধুনিকীকরণ:** আমিরাত যে ধরণের তেল স্বতন্ত্রভাবে বাজারে ছাড়বে, তা পরিশোধন করার জন্য ভারতীয় শোধনাগারগুলোকে আরও আধুনিক করে তুলতে হবে।

উপসংহার

ওপেক থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই প্রস্থান বাজার-চালিত জ্বালানি বাস্তবতার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। ভারতের জন্য এটি সাশ্রয়ী মূল্যে অপরিশোধিত তেল নিশ্চিত করা, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করা এবং আমিরাতের বিনিয়োগকে কাজে লাগিয়ে নিজের সবুজ জ্বালানি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার একটি **কৌশলগত সুযোগ**।

Q. In the context of the United Arab Emirates exit from Organization of the Petroleum Exporting Countries, examine its implications for India's energy security and India-UAE strategic partnership.

1.2.2. জাতিসংঘ মহাসচিব

ভূমিকা

জাতিসংঘ মহাসচিব (UNSG) হলেন জাতিসংঘের **সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা**। এই পদটিকে প্রায়ই "বিশ্বের সবথেকে কঠিন কাজ" হিসেবে বর্ণনা করা হয়। জাতিসংঘ যখন তার **৮০তম বছরে** পদার্পণ করছে, তখন এই পদের ভূমিকা কেবল একজন ম্যানেজারের গণ্ডি পেরিয়ে একজন গুরুত্বপূর্ণ **বিশ্বস্ত মধ্যস্থতাকারীতে** রূপান্তরিত হয়েছে।

সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো

- **ধারা ৯৭ (জাতিসংঘ সনদ):** এটি মহাসচিবকে সংস্থার **"প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা"** হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে **সাধারণ পরিষদ** (General Assembly) কর্তৃক নিযুক্ত হন।
- **ধারা ৯৯:** এটি মহাসচিবকে একটি অনন্য **রাজনৈতিক ক্ষমতা** দেয়। এর মাধ্যমে তিনি এমন যেকোনো বিষয় যা **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা** বিঘ্নিত করতে পারে বলে মনে করেন, তা সরাসরি **নিরাপত্তা পরিষদের** নজরে আনতে পারেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব নিয়োগ প্রক্রিয়া

- **নির্বাচন:** নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়।
- **ভেটো** (Veto) **ক্ষমতা:** যেহেতু নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ আবশ্যক, তাই **পি৫** (P5) **সদস্য** (আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স)-দের যেকোনো একজন প্রার্থীর বিপক্ষে ভোট দিলে সেই প্রার্থী আর নিযুক্ত হতে পারেন না। ফলে সাধারণত প্রভাবশালী দেশগুলোর পরিবর্তে **"আপসকারী প্রার্থী"** বা অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ দেশগুলো থেকে প্রার্থী বেছে নেওয়া হয়।
- **প্রথা:**
  - **আঞ্চলিক আবর্তন** (Regional Rotation)**:** সাধারণত বিশ্বের পাঁচটি অঞ্চলের মধ্যে এই পদটি পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। বর্তমান **২০২৬-২৭ চক্রটি** লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের (LAC) দিকে তাকিয়ে আছে।
  - **মেয়াদ:** সাধারণত **৫ বছরের মেয়াদ**, যা একবার নবায়ন করা যেতে পারে।
  - **লিঙ্গ বৈষম্য:** আজ পর্যন্ত কোনো **নারী** মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি, যা ২০২৬ সালের নির্বাচনে **লিঙ্গ সমতাকে** একটি মূল বিষয়ে পরিণত করেছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের ভূমিকা

১. **প্রশাসনিক ভূমিকা** (CEO-এর মতো কাজ)

- **সচিবালয়ের প্রধান:** জাতিসংঘের নির্বাহী শাখা অর্থাৎ সচিবালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করেন, যেখানে ৩৬,০০০-এর বেশি কর্মী কর্মরত।
- **বাজেট ব্যবস্থাপনা:** জাতিসংঘের বাজেট প্রণয়ন এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ও তহবিলে সম্পদের **দক্ষ বণ্টন** নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাঁর।
- **কর্মী নিয়োগ:** ধারা ১০১ অনুযায়ী, তিনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা এবং **ভৌগোলিক বৈচিত্র্য** (সব দেশের প্রতিনিধিত্ব) বজায় রাখা তাঁর অন্যতম কাজ।
- **রিপোর্ট প্রদান:** ধারা ৯৮ অনুযায়ী, প্রতি বছর সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘের কাজের ওপর **বার্ষিক প্রতিবেদন** জমা দেওয়া তাঁর বাধ্যতামূলক কাজ।

২. **রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ভূমিকা (কূটনীতিকের কাজ)**

- **"গুড অফিস" (Good Offices):** মহাসচিব তাঁর নিরপেক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক বিরোধে **মধ্যস্থতাকারী** হিসেবে কাজ করেন। একে **প্রতিরোধমূলক কূটনীতি** বলা হয়, যাতে বিরোধ বড় সংঘাতে রূপ না নেয়।
- **ধারা ৯৯-এর ক্ষমতা:** এটি তাঁর সবথেকে শক্তিশালী রাজনৈতিক ক্ষমতা। এর মাধ্যমে তিনি বিশ্বশান্তি রক্ষায় সরাসরি নিরাপত্তা পরিষদে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।
- **দূত নিয়োগ:** সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তি আলোচনা পরিচালনার জন্য তিনি **"বিশেষ প্রতিনিধি"** বা **"ব্যক্তিগত দূত"** নিয়োগ করার ক্ষমতা রাখেন।
- **বিশ্বের বিবেক:** জলবায়ু পরিবর্তন, অতিমারি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যুতে তিনি **"বিশ্বের বিবেক"** হিসেবে কথা বলেন।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা (সিভিল সার্ভেন্ট বা সরকারি চাকুরের মতো কাজ)**

- **সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়:** তিনি জাতিসংঘের সব সংস্থাগুলোর (যেমন- WHO, IMF, বিশ্বব্যাংক) প্রধানদের নিয়ে গঠিত **সমন্বয় বোর্ডের (CEB)** সভাপতিত্ব করেন।
- **প্রধান অঙ্গগুলোতে অংশগ্রহণ:** সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) এবং ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিলের সভায় সচিব হিসেবে উপস্থিত থাকা তাঁর দায়িত্ব।
- **নির্দেশনা বাস্তবায়ন:** জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গগুলো কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তাবসমূহ **বাস্তবায়ন** করা তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ।

বর্তমান নির্বাচনের প্রধান সমস্যাসমূহ

- **ভূ-রাজনৈতিক স্থবিরতা (Geopolitical Paralysis):** ইউক্রেন, গাজা এবং সুদান নিয়ে **পিৎ (P5)** সদস্যদের মধ্যে বাড়তে থাকা তিক্ততা বারবার **ভেটো (Veto)** প্রয়োগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর ফলে উচ্চ-পর্যায়ের নিরাপত্তা বিষয়গুলোতে নিরাপত্তা পরিষদ **অকার্যকর** হয়ে পড়েছে।
- **আর্থিক তারল্য সংকট (Financial Liquidity Crisis):** প্রধান সদস্য দেশগুলোর পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে **"নির্ধারিত চাঁদা" (Assessed Contributions)** পরিশোধ না করা বা দেরিতে দেওয়ার ফলে জাতিসংঘ অভূতপূর্ব আর্থিক সংকটে পড়েছে। এটি সংস্থাকে ব্যয় সংকোচনে বাধ্য করছে এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা:** উন্নত বিশ্ব (Global North) এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের (Global South) মধ্যে বাড়তে থাকা আস্থার সংকট **"সংস্কৃত বহুপাক্ষিকতাবাদ" (Reformed Multilateralism)**-এর দাবিকে আরও জোরালো করেছে। বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণ এবং নেতৃত্বে লিঙ্গ সমতার বিষয়টি সামনে এসেছে।
- **এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রায় স্থবিরতা:** ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে মাত্র **১৮% লক্ষ্যমাত্রা** সঠিক পথে রয়েছে। ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য নতুন মহাসচিবকে বিশাল অর্থায়নের ঘাটতি মেটাতে হবে এবং "এসডিজি ক্লান্তি" দূর করতে হবে।
- **শান্তি রক্ষা মিশনের অবক্ষয়:** মালি-র মতো জায়গা থেকে শান্তিরক্ষা মিশন সরিয়ে নিতে বাধ্য হওয়া এবং বড় যুদ্ধ থামাতে না পারা—এই পরিস্থিতি **ধারা ৯৯** এবং পুনরুজ্জীবিত **প্রতিরোধমূলক কূটনীতির** মাধ্যমে "মৌলিক কাজে ফিরে যাওয়ার" প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে।
- **"গ্লোবাল কমন্স" বা বৈশ্বিক সাধারণ সম্পদের শাসন: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), বায়ো-টেকনোলজি এবং মহাকাশ প্রযুক্তির** দ্রুত উন্নতি আন্তর্জাতিক আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। মহাসচিবকে এই ক্ষেত্রগুলোতে বৈশ্বিক নিয়ম তৈরিতে নেতৃত্ব দিতে হবে যাতে এগুলি যুদ্ধ বা বৈষম্যের নতুন হাতিয়ার না হয়ে ওঠে।

"সংস্কৃত বহুপাক্ষিকতাবাদ" নিয়ে ভারতের অবস্থান

১. **ভারতের দাবির মূল স্তম্ভ**

- **নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণ:** ভারত একটি সম্প্রসারিত নিরাপত্তা পরিষদে **স্থায়ী সদস্যপদ** চায়। ভারত "দ্বি-স্তরীয়" ব্যবস্থার (ভেটো ছাড়া স্থায়ী আসন) বিরোধী এবং সমতা নিশ্চিত করতে বর্তমান পি৫ সদস্যদের মতো একই ক্ষমতা দাবি করে।
- **গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর:** উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বঘোষিত নেতা হিসেবে ভারত দাবি করে যে আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে **নির্ণায়ক ভূমিকা** থাকতে হবে।
- **সামগ্রিক সংস্কার:** জাতিসংঘের বাইরে ভারত আইএমএফ (IMF) এবং বিশ্বব্যাংকের মতো **আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (IFIs)** সংস্কার চায় যাতে এসডিজি অর্থায়নের ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের ঘাটতি মেটানো যায়।

২. **ভেটো ক্ষমতা নিয়ে কৌশলগত নমনীয়তা**

ভারত মনে করে স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভেটো অপরিহার্য, তবে ২০২৬ সালে তারা **জি৪ (G4)** প্রস্তাবের (ভারত, ব্রাজিল, জার্মানি, জাপান) মাধ্যমে কিছুটা কৌশলগত নমনীয়তা দেখিয়েছে:

- **ভেটো স্থগিতকরণ (Veto Deferral):** আলোচনার অচলাবস্থা কাটাতে নতুন স্থায়ী সদস্যদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের (যেমন **১৫ বছর**) জন্য ভেটো ক্ষমতা স্থগিত রাখার প্রস্তাব দিয়েছে।

ভবিষ্যৎ পন্থা

- **রাজনৈতিক বৈধতা বৃদ্ধি:** ভারত, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নিরাপত্তা পরিষদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে **"সংস্কৃত বহুপাক্ষিকতাবাদ"**-এর দিকে এগিয়ে যাওয়া।
- **আর্থিক স্থায়িত্ব:** চাঁদা সংগ্রহের জন্য আরও শক্তিশালী ব্যবস্থা করা এবং আয়ের উৎস **বৈচিত্র্যময়** করা, যাতে সচিবালয় বড় দাতাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত থাকে।
- **ধারা ৯৯-এর সক্রিয় ব্যবহার:** পরবর্তী মহাসচিবকে কেবল একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক না হয়ে একজন **"সক্রিয় মধ্যস্থতাকারী"** হয়ে উঠতে হবে এবং ধারা ৯৯ প্রয়োগ করে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহেলিত সংঘাতগুলোর দিকে নজর দিতে বাধ্য করতে হবে।
- **প্রতিরোধমূলক কূটনীতিকে অগ্রাধিকার:** সংঘাত হওয়ার পর শান্তিরক্ষী পাঠানোর চেয়ে সংঘাত যাতে না হয় সেই **প্রতিরোধমূলক কূটনীতি** এবং পর্দার আড়ালের আলোচনায় বেশি সম্পদ ও গুরুত্ব দিতে হবে।
- **নতুন প্রযুক্তির শাসন:** এআই (AI) নৈতিকতা, মহাকাশ নিরাপত্তা এবং ডিপ-টেক প্রযুক্তির জন্য **সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক নিয়ম** তৈরি করা।

উপসংহার

পরবর্তী মহাসচিবকে জাতিসংঘকে একটি স্থবির আমলাতন্ত্র থেকে একটি স্থিতিস্থাপক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মধ্যস্থতাকারীতে রূপান্তর করতে হবে। তাঁর সাফল্য নির্ভর করবে পি৫ দেশগুলোর স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রেখে কীভাবে তিনি **গ্লোবাল সাউথের** অধিকার রক্ষা করেন এবং বিশ্বশান্তি ফিরিয়ে আনেন তার ওপর।

Q. "Discuss the significance of the election of the United Nations Secretary-General in the context of the ongoing crisis of multilateralism. Examine the key challenges faced by the UN and suggest reforms to enhance its effectiveness." (15 Marks)

***

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. রুপির অবমূল্যায়ন এবং বিনিয়োগের ওপর এর প্রভাব

ভূমিকা

রুপির অবমূল্যায়ন (Rupee Depreciation) বলতে বোঝায় বাজারে নির্ধারিত বিনিময় হার ব্যবস্থায় প্রধান বিদেশি মুদ্রাগুলোর (মূলত মার্কিন ডলার) তুলনায় ভারতীয় রুপির (INR) মান কমে যাওয়া। ২০২৬ সালে রুপি ব্যাপক অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অপরিশোধিত খনিজ তেলের দাম বাড়ার কারণে সম্প্রতি এটি প্রতি ডলারে **৯৪ টাকার** গণ্ডি অতিক্রম করেছে।

রুপির অবমূল্যায়নের কারণসমূহ

১. **বৈশ্বিক বা বাহ্যিক কারণসমূহ**

- **ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত:** পশ্চিম এশিয়ায় (ইসরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ইরান) উত্তেজনার ফলে বিনিয়োগকারীরা উদীয়মান বাজারের মুদ্রা ত্যাগ করে ডলার এবং সোনার মতো **'সেফ-হেভেন' (নিরাপদ বিনিয়োগ)** সম্পদের দিকে ঝুঁকছেন।
- **খনিজ তেলের দাম বৃদ্ধি:** তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে **১১৫ ডলার** ছাড়িয়ে যাওয়ায় ভারতের আমদানির খরচ বেড়ে গেছে, যার ফলে ডলারের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে।
- **আর্থিক নীতির পার্থক্য:** আরবিআই সুদের হার **৫.২৫%**-এ স্থির রাখলেও, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের উচ্চ সুদের হার বিনিয়োগকারীদের ভারতের বাজার থেকে সরিয়ে আমেরিকার দিকে টেনে নিচ্ছে।
- **ডলারের শক্তি:** বিশ্ববাজারে **ডলার ইনডেক্স** (DXY) শক্তিশালী হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই ডলারের তুলনায় রুপির মান দুর্বল হয়ে পড়ছে।

২. **অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ**

- **FPI বহিঃপ্রবাহ:** বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা (FPI) ভারতের শেয়ার ও ঋণ বাজার থেকে ক্রমাগত বিনিয়োগ তুলে নেওয়ায় রুপির সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে।
- **ক্রমবর্ধমান ক্যাড** (CAD): জ্বালানি ও ইলেকট্রনিক্স আমদানির উচ্চ ব্যয়ের কারণে **চলতি হিসাবের ঘাটতি** (Current Account Deficit) বাড়ছে, যা রুপির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।
- **মুদ্রাস্ফীতির পার্থক্য:** বাণিজ্যিক অংশীদার দেশগুলোর তুলনায় ভারতের অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি বেশি হওয়ায় **ক্রয়ক্ষমতার সমতা** (PPP) অনুযায়ী রুপির মান কমে যাচ্ছে।
- **ঋণ পরিশোধ:** ভারতীয় কোম্পানিগুলো তাদের নেওয়া **বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ** (ECBs) পরিশোধ করার জন্য ডলার কেনায় বাজারে ডলারের চাহিদা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

৩. **বাজারের মানসিকতা ও প্রযুক্তিগত কারণ**

- **REER সংশোধন:** রুপির **রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট** (REER) তার গড় মাত্রার (~৯২.৭২) নিচে নেমে আসা ইঙ্গিত দেয় যে, রপ্তানি সক্ষমতা বাড়াতে রুপির মান কম রাখা হচ্ছে।
- **ফটকা কারবার** (Speculative Behavior): মুদ্রা বাজারে ব্যবসায়ীরা যখন মনে করেন রুপির মান আরও কমবে, তখন আমদানিকারকরা দ্রুত ডলার কিনে রাখেন এবং রপ্তানিকারকরা ডলার দেশে আনতে দেরি করেন, যা পতনকে আরও ত্বরান্বিত করে।

রুপির অবমূল্যায়নের প্রভাব

মুদ্রার মান এবং বিদেশি পুঁজির মধ্যে সম্পর্কটি চক্রাকার এবং এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ওপর প্রভাব

- **বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (FPI):**
  - **পুঁজি প্রত্যাহার:** রুপির মান কমলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রকৃত লাভ কমে যায়। এর ফলে তারা ভারতের শেয়ার ও বন্ড বাজার থেকে ব্যাপক হারে বিনিয়োগ তুলে নেয়।
  - **মূল্যায়ন ঝুঁকি:** ক্রমাগত অবমূল্যায়ন অর্থনৈতিক অস্থিরতার সংকেত দেয়, ফলে নতুন বিনিয়োগে মন্দা দেখা দেয়।
- **বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI):**
  - **ব্যয় সুবিধা:** দুর্বল রুপি বিদেশি কোম্পানিগুলোর জন্য ভারতের সম্পদ (জমি, শ্রম ও যন্ত্রপাতি) সস্তা করে দেয়। এটি উৎপাদন খাতে (যেমন PLI স্কিম) নতুন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে পারে।
  - **দীর্ঘমেয়াদী অনিশ্চয়তা:** শুরুতে বিনিয়োগ সস্তা হলেও, মুদ্রার অস্থিরতা ভবিষ্যতে মুনাফা নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি করে।

দেশীয় কর্পোরেট বিনিয়োগের ওপর প্রভাব

- **বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ (ECBs):** যেসব ভারতীয় কোম্পানি বিদেশ থেকে ডলার ঋণ নিয়েছে, রুপির মান কমায় তাদের **ঋণ পরিশোধের বোঝা** বেড়ে যায়। এতে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের জন্য হাতে থাকা পুঁজি কমে যায়।
- **আমদানি করা কাঁচামালের খরচ বৃদ্ধি:** ইলেকট্রনিক্স, সার এবং রাসায়নিকের মতো শিল্পগুলো আমদানির ওপর নির্ভরশীল। কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় কোম্পানিগুলোর লাভের অংশ কমে যায় এবং নতুন কারখানা বা পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ (CapEx) ধীর হয়ে পড়ে।
- **রপ্তানি-মুখী খাত: আইটি পরিষেবা, টেক্সটাইল এবং ওষুধ শিল্প** এর ফলে লাভবান হয়। তাদের ডলারের আয় রুপিতে রূপান্তরিত করলে আগের চেয়ে বেশি টাকা পাওয়া যায়, যা ব্যবসা প্রসারে সহায়তা করে।

খুচরো বা ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ওপর প্রভাব

- **শেয়ার বাজার:** সাধারণত রুপির পতন শেয়ার বাজারের জন্য নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়। তবে **রপ্তানি-নির্ভর** কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম বাড়তে পারে।
- **সোনা:** যেহেতু ভারত অধিকাংশ সোনা আমদানি করে, তাই রুপি দুর্বল হলে দেশে সোনার দাম বেড়ে যায়। এর ফলে যাদের আগে থেকে গোল্ড ইটিএফ (Gold ETF) বা বন্ডে বিনিয়োগ আছে, তারা লাভবান হন।
- **আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ড:** যারা বিদেশি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন, রুপির মান কমায় তাদের **নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV)** বৃদ্ধি পায়, কারণ ডলারের তুলনায় তাদের বিনিয়োগের মান রুপিতে বেশি দেখায়।

রুপির অবমূল্যায়ন রোধে গৃহীত নীতিগত পদক্ষেপসমূহ

১. **আরবিআই (RBI) এর পদক্ষেপ (আর্থিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক)**

- **ফরেক্স মার্কেট হস্তক্ষেপ:** রুপির অত্যাধিক অস্থিরতা কমাতে এবং এর পতন রোধ করতে আরবিআই সক্রিয়ভাবে তার **বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার (Forex Reserves)** থেকে ডলার বিক্রি করছে।
- **ডেরিভেটিভ মার্কেটে নিয়ন্ত্রণ:** রুপির ওপর ফাটকা কারবার বা 'শর্টিং' বন্ধ করতে ব্যাংকগুলোর দৈনিক নিট ওপেন কারেন্সি পজিশনের ওপর **১০০ মিলিয়ন ডলারের সীমা** আরোপ করা হয়েছে এবং **নন-ডেলিভারেবল ফরওয়ার্ডস (NDFs)** সীমিত করা হয়েছে।

- **বাণিজ্য ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি:** পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিকারকদের সহায়তা করতে **রপ্তানি ঋণের মেয়াদ (Tenor) বাড়িয়ে ৪৫০ দিন** করা হয়েছে (৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত)।
- **পুঁজি প্রবাহে উৎসাহ প্রদান:** তারল্য বজায় রাখতে **বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ (ECBs)** সংক্রান্ত নিয়ম শিথিল করা হয়েছে এবং বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের (FPIs) জন্য সংশোধিত নিয়মগুলো পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. **সরকারের পদক্ষেপ (রাজস্ব ও কাঠামোগত)**

- **আমদানি যৌক্তিকীকরণ:** ডলারের চাহিদা কমাতে সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স এবং প্রতিরক্ষা খাতের মতো কৌশলগত ক্ষেত্রে **আইএসএম ২.০ (ISM 2.0)** এবং বর্ধিত **পিএলআই (PLI) স্কিম** এর মাধ্যমে **আমদানি বিকল্প (Import Substitution)** ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হচ্ছে।
- **জ্বালানি নিরাপত্তা:** রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলোকে খোলা বাজার থেকে ডলার কেনা কমিয়ে **বিশেষ ক্রেডিট সুবিধা** ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তেলের আমদানি বিল কমাতে **ইথানল মিশ্রণের (Ethanol blending)** হার বাড়ানো হয়েছে।
- **রুপির আন্তর্জাতিকীকরণ:** ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং রাশিয়ার মতো দ্বিপাক্ষিক অংশীদারদের সাথে **ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্টের (Vostro accounts)** মাধ্যমে রুপিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সহজ করা হচ্ছে।
- **রাজস্ব শৃঙ্খলা:** উচ্চ-মূল্যের রপ্তানি (যেমন: বায়োফার্মা শক্তি - Biopharma SHAKTI) বৃদ্ধি এবং অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে **চলতি হিসাবের ঘাটতি (CAD)** ব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. **স্বল্পমেয়াদী: কৌশলগত স্থিতিশীলতা**

- **পরিমিত হস্তক্ষেপ:** আরবিআই-এর উচিত রুপির পতনকে সরাসরি না থামিয়ে বরং একে 'স্মুদিং' বা মন্থর করা। এতে বড় ধরনের সঙ্কটের জন্য **ফরেক্স রিজার্ভ** সংরক্ষিত থাকবে এবং আতঙ্কিত হয়ে বাজার থেকে বিনিয়োগ তুলে নেওয়া বন্ধ হবে।
- **ডেরিভেটিভ নজরদারি জোরদার:** ২০২৬ সালে এনডিএফ (NDF) মার্কেটের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে বিদেশি বাজার দেশীয় রুপির দাম নির্ধারণ করতে না পারে।
- **বিশেষ সোয়াপ উইন্ডো:** তেল বিপণন সংস্থাগুলোর (OMCs) জন্য একটি ডেডিকেটেড ফরেক্স সোয়াপ উইন্ডো প্রদান করা, যাতে তারা সরাসরি আরবিআই থেকে ডলার পায় এবং বাজারে হঠাৎ করে ডলারের চাপ না বাড়ে।

২. **মধ্যমেয়াদী: বহিরাগত খাতকে শক্তিশালী করা**

- **রুপির আন্তর্জাতিকীকরণ:** ডলারের প্রয়োজনীয়তা কমাতে আরও অনেক দেশের সাথে **স্পেশাল রুপি ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্ট (SRVA)** দ্রুত কার্যকর করা।
- **পুঁজি প্রবাহের বৈচিত্র্য:** অস্থির এফপিআই (FPI) বা 'হট মানি' থেকে নজর সরিয়ে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থিতিশীল **সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI)** বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া। এর জন্য নিয়মনীতি সহজ করা এবং **চারটি শ্রম কোড** বাস্তবায়ন করা জরুরি।
- **রপ্তানি সক্ষমতা:** কিছুটা 'অবমূল্যায়িত' রুপির সুযোগ নিয়ে শ্রম-নিবিড় রপ্তানি (যেমন: টেক্সটাইল, চামড়া এবং এমএসএমই পণ্য) বাড়ানো, যাতে আমদানির উচ্চ খরচ পুষিয়ে নেওয়া যায়।

৩. **দীর্ঘমেয়াদী: কাঠামোগত স্থিতিশীলতা**

- **জ্বালানি নির্ভরতা কমানো:** রুপির অস্থিরতার প্রধান কারণ হলো অপরিশোধিত তেল। এটি কমাতে **জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন** এবং ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা দ্রুত পূরণ করতে হবে।

- **ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন ২.০:** সেমিকন্ডাক্টর এবং ওষুধের কাঁচামালের (APIs) মতো উচ্চ-মূল্যের আমদানির ক্ষেত্রে কেবল যন্ত্রাংশ জোড়া লাগানো নয় বরং 'গভীর উৎপাদন' বা **ডিপ ম্যানুফ্যাকচারিং**-এ জোর দিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো।
- **স্থানীয় বন্ড মার্কেট শক্তিশালী করা:** ব্লুমবার্গ বা জেপি মর্গানের মতো বৈশ্বিক সূচকে ভারতীয় সরকারি বন্ডকে অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহিত করা, যাতে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি আকৃষ্ট করা যায়।

উপসংহার

বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণে রুপির এই অবমূল্যায়ন ঠেকাতে কেবল সাময়িক হস্তক্ষেপ নয়, বরং কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন। জ্বালানি আমদানি কমিয়ে, রুপির আন্তর্জাতিকীকরণ করে এবং রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারত মুদ্রার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী **কৌশলগত অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা** অর্জন করতে পারে।

Q. Currency depreciation acts as a double-edged sword for an emerging economy. Discuss how a weakening Rupee influences India's trade balance, and suggest structural measures beyond RBI intervention to ensure long-term exchange rate stability. (15 Marks)

2.2. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

2.2.1. ভারতের মহাকাশ কূটনীতি

ভূমিকা

ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ISRO-এর নেতৃত্বে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি আজ স্বনির্ভরতা থেকে কৌশলগত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার স্তরে পৌঁছেছে। বর্তমান সময়ে **মহাকাশ কূটনীতি** বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভারতের মহাকাশ সহযোগিতার বিবর্তন

প্রথম পর্যায়: প্রযুক্তিগত ভিত্তি তৈরি (১৯৬০-এর দশক – ১৯৭০-এর দশক)

- **"অনুসন্ধানী" যুগ:** এই সময়ে ভারতের মূল লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে মহাকাশ গবেষণার অবকাঠামো বা পরিকাঠামো তৈরি করা।
- **প্রধান সাফল্য:** ১৯৬৩ সালে আমেরিকার তৈরি **নাইকি-অ্যাপাচি** (Nike-Apache) রকেট উৎক্ষেপণ; ১৯৭৫ সালে ভারতের নিজস্ব উপগ্রহ **আর্যভট্ট** সোভিয়েত ইউনিয়নের রকেটের সাহায্যে মহাকাশে পাঠানো।
- **সামাজিক প্রভাব:** SITE (সাইট) কর্মসূচির মাধ্যমে আমেরিকান উপগ্রহ ব্যবহার করে ভারতের ২,৪০০টিরও বেশি গ্রামে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, যা প্রমাণ করে যে মহাকাশ প্রযুক্তি গ্রামীণ উন্নয়নেও কার্যকর।

দ্বিতীয় পর্যায়: বিকাশ ও ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত (১৯৮০-এর দশক – ১৯৯০-এর দশক)

- **ইঞ্জিন প্রযুক্তিতে উন্নতি:** ফ্রান্সের **ভাইকিং** (Viking) প্রযুক্তির সহায়তায় ভারত সফলভাবে নিজস্ব **বিকাশ** (Vikas) **ইঞ্জিন** তৈরি করে।
- **ক্রায়োজেনিক সংকট:** ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে আমেরিকা MTCR-এর অজুহাত দেখিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন চুক্তি আটকে দেয়। এর ফলে ভারত নিজেই এই প্রযুক্তি তৈরির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং স্বনির্ভর হওয়ার পথে এগিয়ে যায়।

- **বাণিজ্যিক নির্ভরতা:** ভারী INSAT উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য ভারত তখন ফ্রান্সের **আরিয়ানস্পেস** (Arianespace)-এর ওপর নির্ভর করত।

তৃতীয় পর্যায়: বিশ্বমানের পরিষেবা প্রদানকারী (২০০০ – ২০১৯)

- **নির্ভরযোগ্যতা:** ভারতের PSLV রকেট বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। ২০১৭ সালে ভারত একটি মাত্র অভিযানে রেকর্ড **১০৪টি উপগ্রহ** উৎক্ষেপণ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়।
- **বৈজ্ঞানিক সমন্বয়:** ভারতের প্রথম চন্দ্রাভিযান **চন্দ্রযান-১** আমেরিকা ও ইউরোপের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বহন করে চাঁদে জলের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। এছাড়া মঙ্গল অভিযানে (**মঙ্গলযান**) ভারত আমেরিকার ডিপ স্পেস নেটওয়ার্কের সহায়তা নেয়।
- **নরম শক্তি** (Soft Power): দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য ভারত **সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট** (GSAT-9) উপহার হিসেবে পাঠিয়ে "মহাকাশ কূটনীতি"র নতুন নজির গড়ে।

চতুর্থ পর্যায়: কৌশলগত অংশীদার ও বাণিজ্যিক শক্তি (২০২০ – ২০২৬)

- **যৌথ উদ্ভাবন:** ভারত এখন আর কেবল প্রযুক্তির ক্রেতা নয়, বরং অংশীদার। আমেরিকার নাসার সাথে NISAR এবং জাপানের সাথে LUPEX-এর মতো মিশনে ভারত "সহ-বিকাশকারী" হিসেবে কাজ করছে।
- **মানুষবাহী মহাকাশ অভিযান: গগনযান** মিশনের জন্য রাশিয়া থেকে প্রশিক্ষণ এবং আমেরিকা ও ফ্রান্সের থেকে মহাকাশ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। ২০২৫ সালের **অ্যাক্সিওম-৪** (Axiom-4) মিশনের মাধ্যমে একজন ভারতীয় মহাকাশচারী আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) যাবেন।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার:** NSIL এবং IN-SPACe-এর মতো সংস্থা তৈরির মাধ্যমে মহাকাশ খাতে ১০০% **সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ** (FDI) এবং OneWeb-এর মতো বেসরকারি বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর প্রবেশের পথ সুগম করা হয়েছে।

ভারতের মহাকাশ কূটনীতির মূল স্তম্ভসমূহ

১. **মহাকাশ পরিষেবার প্রধান প্রদানকারী (গ্লোবাল সাউথ নেতৃত্ব)**
   - **দক্ষতা বৃদ্ধি:** UNNATI-এর মতো প্রোগ্রামের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কর্মকর্তাদের ন্যানো-স্যাটেলাইট তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারত তার সাশ্রয়ী উদ্ভাবন বিশ্বকে দেখাচ্ছে।
   - **উন্নয়নের জন্য মহাকাশ:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (**সেন্টিনেল এশিয়া**), টেলি-মেডিসিন এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করছে।
   - **আঞ্চলিক যোগাযোগ: সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট** প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে ভারতের কূটনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করেছে।

২. **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন ও সমতা**
   - **ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক:** একদিকে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলোর সঙ্গে **আর্টেমিস অ্যাকর্ডস** (Artemis Accords) এবং NISAR-এর মতো আধুনিক প্রজেক্টে যুক্ত হওয়া, অন্যদিকে রাশিয়া এবং BRICS জোটের দেশগুলোর সঙ্গে পুরনো বন্ধুত্ব বজায় রাখা।
   - **নিরাপত্তা ক্ষমতা:** মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহার করে **ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে** (Indo-Pacific) নজরদারি এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩. **বাণিজ্যিক প্রসার ও শাসনব্যবস্থা**
   - **বাজার দখল:** PSLV ও SSLV-এর মতো সাশ্রয়ী রকেটের মাধ্যমে ৪০০ বিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক মহাকাশ অর্থনীতিতে ভারতের অংশীদারিত্ব বাড়ানো।

- **নীতি নির্ধারণ:** মহাকাশে সবার সমান অধিকার এবং টেকসই ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করে ভারত এখন আন্তর্জাতিক মহাকাশ আইনের অন্যতম প্রধান নীতি-নির্ধারক হয়ে উঠেছে।

৪. **স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা (মহাকাশ নীতিশাস্ত্র)**

- **মহাকাশ পরিস্থিতি সচেতনতা (SSA):** মহাকাশের আবর্জনা বা ধ্বংসাবশেষ ট্র্যাক করতে ভারত **প্রজেক্ট নেত্র (Project NETRA)**-এর মতো উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে মহাকাশ পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে।
- **বৈশ্বিক দায়িত্ব:** মহাকাশে অস্ত্রের ব্যবহার রোধ এবং আন্তর্জাতিক আইন (যেমন- লায়বিলিটি কনভেনশন) মেনে চলার মাধ্যমে ভারত বিশ্বস্ত দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রধান দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পৃক্ততা

১. **দ্বিপাক্ষিক সম্পৃক্ততা**

- **আমেরিকা (NASA):**
  - **NISAR:** একটি যৌথ পৃথিবী-পর্যবেক্ষণ মিশন (২০২৬ সালে উৎক্ষেপণ), যা বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করবে।
  - **আর্টেমিস অ্যাকর্ডস (Artemis Accords):** আমেরিকার নেতৃত্বাধীন চন্দ্র অভিযান কর্মসূচিতে ভারতের অংশগ্রহণ।
  - **অ্যাক্সিওম-৪ (Axiom-4):** আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) একজন ভারতীয় মহাকাশচারী পাঠানোর জন্য যৌথ মিশন।
- **ফ্রান্স (CNES):**
  - **TRISHNA:** জলবায়ু এবং জল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি যৌথ থার্মাল ইনফ্রারেড ইমেজিং মিশন।
  - **মহাকাশ চিকিৎসা (Space Medicine):** গগনযান মিশনের জন্য জীবন-রক্ষা ব্যবস্থা (Life-support systems) তৈরিতে সহযোগিতা।
- **জাপান (JAXA):**
  - **LUPEX:** লুনার পোলার এক্সপ্লোরেশন মিশন, চাঁদের দক্ষিণ মেরু অন্বেষণের জন্য একটি যৌথ রোভার-ল্যান্ডার প্রকল্প।
- **রাশিয়া (Roscosmos):**
  - **গগনযান** মিশনে ঐতিহাসিক অংশীদার (মহাকাশচারীদের প্রশিক্ষণ এবং স্পেস স্যুট তৈরিতে সহায়তা)।

২. **বহুপাক্ষিক সম্পৃক্ততা (Multilateral Engagements)**

- **ব্রিকস (BRICS) স্পেস কাউন্সিল:**
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পর্যবেক্ষণের তথ্য শেয়ার করার জন্য একটি **রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট কনস্টেলেশন** তৈরি করা।
- **গ্লোবাল সাউথ এবং সার্ক (SAARC):**
  - **সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট:** প্রতিবেশী দেশগুলোকে বিনামূল্যে যোগাযোগ পরিষেবা প্রদান।
  - **উন্নতি (UNNATI) প্রোগ্রাম:** ন্যানো-স্যাটেলাইট অ্যাসেম্বলিংয়ের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর কর্মকর্তাদের ইসরো (ISRO) কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- **কোয়াড (QUAD) স্পেস ওয়ার্কিং গ্রুপ:**
  - ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে **সামুদ্রিক ডোমেইন সচেতনতা (MDA)** এবং জলবায়ু পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ।
- **মহাকাশ ও বড় দুর্যোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চার্টার:**
  - প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় বিশ্ববাসীকে সাহায্য করার জন্য ভারত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন স্যাটেলাইট ডেটা সরবরাহ করে।

ভারতের মহাকাশ সহযোগিতার কৌশলগত গুরুত্ব

১. **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন:** আমেরিকার (**আর্টেমিস অ্যাকর্ডস**) সাথে উচ্চ-প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্বের পাশাপাশি রাশিয়া ও ফ্রান্সের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখা ভারতকে কোনো নির্দিষ্ট শক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে দেয় না এবং ভারতের স্বাধীন ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বজায় রাখে।

২. **জাতীয় নিরাপত্তার গুণক:** NISAR এবং **কোয়াড** (QUAD)-এর মতো যৌথ উদ্যোগগুলো সামুদ্রিক ডোমেইন সচেতনতা এবং সীমান্ত নজরদারি বৃদ্ধি করে। এটি "ডার্ক শিপিং" ট্র্যাক করতে এবং সংবেদনশীল সীমান্ত পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে।

৩. **গ্লোবাল সাউথ নেতৃত্ব: সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট** এবং **উন্নতি** (UNNATI) প্রোগ্রামের মাধ্যমে মহাকাশ প্রযুক্তিকে "নরম শক্তি" (Soft Power) হিসেবে ব্যবহার করে ভারত চীনের "স্পেস সিল্ক রোড"-এর একটি সাশ্রয়ী বিকল্প প্রদান করছে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে ভারতের নেতৃত্বকে মজবুত করছে।

৪. **বাণিজ্যিক ও বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি:** OneWeb এবং Axiom-এর মতো বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব এবং **১০০% সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ** (FDI) নীতির মাধ্যমে ২০৩৩ সালের মধ্যে বিশ্ব মহাকাশ অর্থনীতিতে ভারতের অংশীদারিত্ব **২% থেকে বাড়িয়ে ১০%** করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

৫. **শাসনব্যবস্থার নীতি-নির্ধারক:** COPUOS এবং **আর্টেমিস অ্যাকর্ডস**-এ সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমে ভারত এখন মহাকাশ নীতিশাস্ত্র, ধ্বংসাবশেষ ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশ্বমঞ্চে একজন "নীতি-নির্ধারক" হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

ভারতের মহাকাশ সহযোগিতার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত ঝুঁকি**

- **"প্রযুক্তি অস্বীকার"-এর ইতিহাস:** আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও, উচ্চ-প্রযুক্তি (যেমন: রেডিয়েশন-হার্ডেন্ড চিপস, উন্নত সেমিকন্ডাক্টর) হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পশ্চিমী দেশগুলোর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং MTCR-এর কারণে এখনো সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
- **কৌশলগত ভারসাম্যের চ্যালেঞ্জ:** আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠতা রাশিয়ার মতো পুরনো বন্ধুদের দূরে ঠেলে দিতে পারে (যা গগনযানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ) অথবা আমেরিকা ও চীনের মধ্যকার "শীতল যুদ্ধ"-এর মাঝে ভারতকে ফেলে দিতে পারে।
- **আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা:** চীনের **"স্পেস সিল্ক রোড"** উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিচ্ছে, যা গ্লোবাল সাউথ-এ ভারতের সাশ্রয়ী কূটনীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।

২. **বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা**

- **বাজারের অংশীদারিত্বের ব্যবধান:** ৫৪০ বিলিয়ন ডলারের বিশ্ব মহাকাশ অর্থনীতিতে ভারতের অংশ মাত্র **২%**। পুরনো PSLV-এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং SSLV উৎপাদনে ধীরগতির কারণে ছোট স্যাটেলাইটের বাজারে SpaceX আধিপত্য বিস্তার করছে।
- **এফডিআই (FDI) ও বেসরকারি অংশগ্রহণ:** যদিও ১০০% সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একটি স্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ **জাতীয় মহাকাশ আইন** (National Space Act) না থাকায় বিনিয়োগকারীরা বীমা এবং দায়বদ্ধতার বিষয়ে এখনো সন্দিহান।

৩. **টেকসই মহাকাশ ও শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা**

- **কক্ষপথের যানজট:** মেগা-কনস্টেলেশন (যেমন: স্টারলিঙ্ক) উপগ্রহের সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা সংঘর্ষের ঝুঁকি বাড়ায়। ভারতের **প্রজেক্ট নেত্র** (NETRA) উন্নতি করলেও মহাকাশ পরিস্থিতি সচেতনতায় (SSA) এখনো আমেরিকা ও রাশিয়ার চেয়ে পিছিয়ে আছে।

- **আইনি শূন্যতা:** মহাকাশের খনিজ সম্পদ আহরণ বা কক্ষপথ দখলের বিষয়ে কোনো আন্তর্জাতিক ঐকমত্য নেই। ভারত যখন নিজস্ব স্পেস স্টেশন (BAS) তৈরির পরিকল্পনা করছে, তখন কক্ষপথের সুবিধাজনক জায়গাগুলো আগেভাগে দখল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকছে।

৪. **প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা**

- **একক মহাকাশ বন্দরের ওপর নির্ভরতা:** প্রায় সব আন্তর্জাতিক উৎক্ষেপণ **শ্রীহরিকোটা**র ওপর নির্ভরশীল। **কুলশেখরপত্তনম**-এ দ্বিতীয় বন্দর তৈরির কাজ চললেও, এই বিলম্ব ভারতের উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি উৎক্ষেপণ পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে।
- **সরঞ্জামের নির্ভরশীলতা:** "আত্মনির্ভর ভারত" সত্ত্বেও, মহাকাশ গবেষণার উন্নত ইলেকট্রনিক্স আমদানির ওপর ভারত এখনো অনেক বেশি নির্ভরশীল।

৫. **নৈতিক ও মানবিক দ্বিধা**

- **সম্পদের অগ্রাধিকার:** সমালোচকরা প্রায়ই ভারতের অভ্যন্তরীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তুলনায় উচ্চ-ব্যয়বহুল মহাকাশ মিশনগুলোর (যেমন: মঙ্গলযান-২ বা শুকযান) যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
- **কেসলার সিনড্রোম (Kessler Syndrome):** ভারতীয় মাটি থেকে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক উৎক্ষেপণ মহাকাশে ধ্বংসাবশেষ বা আবর্জনা বৃদ্ধির সমস্যায় অবদান রাখছে। এর ফলে বাণিজ্যিক লাভ এবং মহাকাশের **দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের (LTS)** মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

ভবিষ্যৎ পথপন্থা

১. **আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো শক্তিশালী করা**

- **মহাকাশ আইনের বিধিবদ্ধকরণ:** বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হলো একটি ব্যাপক **জাতীয় মহাকাশ আইন (National Space Act)** পাস করা। এটি দায়বদ্ধতা, বিমা এবং মেধা সম্পত্তির বিষয়ে আইনি নিশ্চয়তা প্রদান করবে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে এবং বৈশ্বিক বেসরকারি বড় কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করা সহজ হবে।
- **IN-SPACe-কে আরও গতিশীল করা:** আন্তর্জাতিক যৌথ উদ্যোগ এবং স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ দ্রুত করার জন্য IN-SPACe-কে একটি শক্তিশালী **"সিঙ্গল উইন্ডো"** ক্লিয়ারেন্স হাউসে রূপান্তর করা।

২. **"শিল্প সহযোগিতার" দিকে রূপান্তর**

- **প্রযুক্তির ক্রয়ের বদলে সহ-উৎপাদন:** কেবল বিদেশ থেকে প্রযুক্তি কেনার বদলে তা যৌথভাবে তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া। **iCET (ভারত-আমেরিকা)**-এর মতো উদ্যোগগুলোকে ব্যবহার করে ভারতে সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট স্থাপন করা, যা বিশেষভাবে মহাকাশ গবেষণার উপযোগী চিপ তৈরি করবে।
- **বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে অন্তর্ভুক্তি:** ভারতের MSME (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প) সংস্থাগুলোকে বোয়িং, এয়ারবাস এবং স্পেসএক্স-এর মতো বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকারী হিসেবে গড়ে তোলা। এর ফলে ভারত কেবল উপগ্রহ উৎক্ষেপণের স্থান নয়, বরং মহাকাশ গবেষণার একটি **"ম্যানুফ্যাকচারিং হাব"** বা উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হবে।

৩. **"মহাকাশ কূটনীতি"র পরিধি বাড়ানো**

- **"বিকশিত" গ্লোবাল সাউথের জন্য মহাকাশ:** কেবল উপগ্রহ উপহার দেওয়া নয়, বরং ভারতের উচিত একটি **"স্পেস-জি২০" (Space-G20)** সচিবালয়ের নেতৃত্ব দেওয়া। এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য দুর্যোগ মোকাবিলা এবং জলবায়ু পর্যবেক্ষণের ডেটা ব্যবহারের নিয়মগুলো সহজ করা যাবে।
- **ত্রিপাক্ষিক জোট:** ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সামুদ্রিক নজরদারি বাড়াতে **ভারত-ফ্রান্স-সংযুক্ত আরব আমিরাত** বা **ভারত-জাপান-অস্ট্রেলিয়া**র মতো ত্রিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।

৪. **মহাকাশ স্থায়িত্বে (LTS) নেতৃত্ব প্রদান**

- **SSA-তে নিয়ম তৈরি:** মহাকাশ পরিস্থিতি সচেতনতা বা SSA-এর জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম তৈরিতে ভারতের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। মহাকাশের আবর্জনা কমানোর প্রযুক্তি এবং **"জিরো ডেব্রি"** (শূন্য ধ্বংসাবশেষ) মিশনের ওপর জোর দিয়ে ভারত নিজেকে মহাকাশের একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরতে পারে।
- **কক্ষপথের ভিড় ব্যবস্থাপনা:** বিশাল উপগ্রহ নেটওয়ার্ক বা মেগা-কনস্টেলেশনগুলোর মাধ্যমে কক্ষপথ দখল করার চেষ্টার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ (UN) ও COPUOS-এ শক্ত অবস্থান নেওয়া, যাতে ছোট দেশগুলোও মহাকাশ ব্যবহারের সমান সুযোগ পায়।

৫. **গবেষণা ও উন্নয়নের (R&D) মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা**

- **কোয়ান্টাম ও ডিপ-টেক:** কোয়ান্টাম যোগাযোগ এবং উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক প্রপালশন প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এই **ভবিষ্যৎমুখী প্রযুক্তিগুলোই** আগামী দশকে মহাকাশে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করবে।
- **ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন (BAS): অ্যাক্সিওম-৪ (২০২৫-২৬)** মিশন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতের নিজস্ব স্পেস স্টেশন তৈরির কাজকে ত্বরান্বিত করা।

উপসংহার

ভারতের মহাকাশ সহযোগিতা আজ পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে কৌশলগত সমমর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারত মহাকাশ পরিষেবার একজন **"প্রধান প্রদানকারী"** হয়ে উঠছে, যা **বিকশিত ভারত** গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশটির নেতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করছে।

Q. "India's space cooperation has evolved from a developmental necessity to a strategic instrument of foreign policy." Discuss in the context of recent global partnerships. (15 Marks)

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video